রেমব্রান্টের আশ্চর্য ক্যানভাস

রেমব্রান্ট। শিল্পী হিসাবে অতুলনীয়। কিন্তু শিল্পীদের দূরদৃষ্টি কি জীবনের ভবিষ্যৎ-ও দেখতে পায়? রেমব্রান্টের আত্মপ্রতিকৃতির ক্রমবিবর্তন থেকে সেই প্রশ্নই উঠে আসছে কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত-র কলমে।

মানুষের মুখ নিয়ে তাঁর বিস্ময়ের অবধি নেই কোনো। জীবনভর তিনি যেন শুধু মুখেরই সাধনা করেছেন। তাঁর তুলির ছোঁয়ায় কত হাজার মুখ যে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তার সঠিক হিসেব রাখেনি কেউ। ক্যানভাসে জন্ম দিয়েছেন তিনি নিজেরও। তিনি, ওলন্দাজ শিল্পী হারমেনজ ভান রাইন রেমব্রান্ট। সারা বিশ্বে যিনি বন্দিত শ্রেষ্ঠতম প্রতিকৃতি-শিল্পী হিসেবে। গুণমানে ও সংখ্যাধিক্যে তাঁর আঁকা প্রতিকৃতি-চিত্রসম্ভারকে অতিক্রম করতে পারেননি প্রায় কেউই। আরো একটি বিশেষ কারণে তিনি স্মরণীয়, সেই কারণটি হল এই যে – আত্মপ্রতিকৃতি রচনায় তিনি ছিলেন পৃথিবীশ্রেষ্ঠ। বলা হয় আত্মপ্রতিকৃতি রচনার মধ্যে দিয়েই আত্মজীবনী লিখে গেছেন রেমব্রান্ট। ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয় যে তাঁর মতো একজন জগৎ-বরেণ্য শিল্পী তেষট্টি বছরের জীবনে নিজের সম্পর্কে লিখে যাননি প্রায় কিছুই। ডায়েরিতে, চিঠিতে, স্কেচখাতার ছেঁড়া পাতায় কোথাও তিনি নেই লিখিত অক্ষরে। অথচ কী ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতময় ঘটনাপূর্ণ জীবন তাঁর। তবু তুলি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাধ্যমে কিছু বলে যাননি তিনি। রেমব্রান্টকে তাই খুঁজে পাওয়া যায় একমাত্র তাঁর ছবিতেই। আরো নির্দিষ্ট করে বললে তাঁর আত্মপ্রতিকৃতিতে। কী নিবিড় পর্যবেক্ষণে নিজের মুখকে বারেবারে উপস্থিত করেছেন তিনি ক্যানভাসে। সমগ্রজীবনে মোট কতগুলি আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছিলেন তিনি? সংখ্যাটি আজও স্থির নিশ্চিত করে বলা যায়নি। তবে তা নব্বই-এর কাছাকাছি তো বটেই। তারমধ্যে ষাটটি তেলরঙে আঁকা আর বাকিগুলি কাগজের বুকে আঁকা ড্রয়িং অথবা ধাতবপাতে করা এচিং। প্রথমবার যখন নিজের মুখ এঁকেছিলেন

তিনি তখন তাঁর বয়স বাইশ, আর শেষ মুখটি এঁকেছেন মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগে। মনে হয় এই অবিরাম আত্ম-অবলোকনের মাঝে রেমব্রান্ট খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন তাঁর সময়কে, পরিপার্শ্বকে এবং কী জানি হয়তো বিশ্বকেও। মানব শরীরের শ্রেষ্ঠ অংশটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিজেকে প্রকাশ করার জন্য।

শিল্পী রেমব্রান্টের ছবিজীবন শুরু হয়েছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালের প্রভার মতো অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে। বাবার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি, ছোটোবেলা থেকেই পড়াশোনার থেকে ছবি আঁকায় মন বেশি। অঙ্কের খাতায় এঁকে রাখেন জীবজন্তুর ছবি। বাবা বুঝলেন চিত্রকলাই ছেলের নিয়তি, তাঁকে ভর্তি করে দিলেন জ্যাকভ ভান নামে স্থানীয় এক শিল্পীর স্কুলে। সেখানে ছবি আঁকার প্রাথমিক ভিতটুকু মজবুত করে রেমব্রান্ট গেলেন সে আমলের আমস্টারডামের বিখ্যাত শিল্পী পিয়েটার লাস্টমানের কাছে। কয়েক বছর তাঁর কাছে কঠোর তালিমের পর স্বাধীন চিত্রশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটল রেমব্রান্টের। তাঁর কাজের গুনে খুব তাড়াতাড়িই খ্যাতি ও সম্মান এসে গেল হাতের মুঠোয়। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই রেমব্রান্টের শহরজোড়া নাম। সরকারী, বেসরকারী সমস্তধরণের প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য কাজের ফরমায়েশ আসে তাঁর কাছে। তেলরঙে ছবি আঁকার পাশাপাশি এচিং-এর কাজেও দারুণ দক্ষতা তাঁর। কাজের সূত্রেই আমস্টারডম শহরের বিখ্যাত আর্টডিলার হেনড্রিক ভান উইলেনবার্গের পরিবারের সান্নিধ্যে আসেন রেমব্রান্ট। পরিণামে তাদেরই পরিবারের সুন্দরী কন্যা সাসকিয়ার সঙ্গে শিল্পীর প্রণয় ও পরিণয়। এই বিয়ের মাধ্যমে রেমব্রান্ট আরো পরিচিত হয়ে উঠলেন সমাজের ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও রেমব্রান্টের জয়ধ্বনিতে মুখর। দ্রুতগতিতে ছবি আঁকতেন রেমব্রান্ট, ফরমায়েশও প্রচুর। ফলে খুব দ্রুতই অর্থ ও সম্পদে ধনী হয়ে উঠলেন তিনি। শহরের মাঝখানে বানালেন প্রাসাদোপম বাড়ি। আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলে নানা জায়গা থেকে কিনে আনলেন বিলাস-বৈভবের অজস্র উপকরণ। স্ত্রী সাসকিয়াকে মনের মতো সঙ্গী পেয়েছেন শিল্পী। মধুময় দিনগুলি পার হতে লাগল উদ্দামগতিতে। তাঁর আঁকা এইসময়ের ছবিগুলিতেও লাগল সেই আনন্দের ছোঁয়াচ। সাসকিয়ার সঙ্গে সুরাপাত্র হাতে রেমব্রান্টের একটি অসাধারণ চিত্রও রচনা হয় এই সময়েই। সেই আত্মপ্রতিকৃতিতেই বোঝা যায় কী দুরন্ত ভোগলিপ্সার মধ্যে অবস্থান করছেন তিনি তখন। ছবির চারপাশে সুখ-সমৃদ্ধির উচ্চকিত উচ্চারণ। যদিও শিল্পীর জীবনে এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হল না। ১৬৩৫ সালে রেমব্রান্টের বিবাহিত জীবনের সূচনা, আর তার অন্তিম পরিণতি ১৬৪২-এ। মাত্র সাতটি বছর, তারই মধ্যে জন্ম নিয়ে ফিরে চলে গেছে তিন-তিনটি সন্তান। চতুর্থ সন্তান টিটুসের জন্ম দিয়ে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চলে গেলেন প্রিয়তমা সাসকিয়া। ১৬৪২ সালে রেমব্রান্টের আকাশে ঘনিয়ে এল বিপর্যয়ের ঘনমেঘ। অত্যধিক বিলাস-বৈভবের কারণে ইতিমধ্যেই ঋণগ্রস্ত হয়েছেন তিনি। যদিও মনের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস, ছবি এঁকে চুকিয়ে দেবেন পাওনাদারদের সমস্ত টাকা।

দায়িত্ব পেলেন আমস্টারডামের নৈশরক্ষীবাহিনীর একটি বড়োসড়ো গ্রুপ-ছবি আঁকার। মনপ্রাণ দিয়ে আঁকলেন শিল্পী। রাতের অন্ধকারে বিচিত্রভঙ্গিতে নৈশপ্রহরীরা। সে ছবিতে প্রহরার চেয়ে প্রহরীদের আমোদ-ফূর্তিটাই মুখ্যভূমিকা পেল। ছবিতে আলো-আঁধারিতে সমানভাবে স্পষ্ট হলনা সকলের মুখ। নৈশরক্ষীবাহিনীর দলপতি ক্যাপ্টেন কক্ প্রত্যাখ্যান করলেন সে ছবি। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল শিল্পীর বদনাম। এদিকে তরুণী স্ত্রী সাসকিয়ার মৃত্যুর পর হেনড্রিকযে নামে যে পরিচারিকাটি শিল্পীর শিশুপুত্রকে দেখাশোনা করতেন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার খবর বিকৃতভাবে রটিয়ে দিল নিন্দুকেরা। অথচ হেনড্রিকযে প্রকৃত অর্থেই ছিলেন

গৃহকর্মে নিপুণা, শান্তস্বভাবের একজন ভদ্রমহিলা। সাসকিয়ার মৃত্যুর পর শিল্পীর পরিবারকে ধরে রেখেছিলেন তিনিই। কিন্তু রেমব্রান্টের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এসব কিছু না ভেবে, নিন্দুকদের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে মামলা ঠুকে দিল শিল্পীর বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি সাসকিয়ার একমাত্র জীবিত শিশুসন্তান টিটুসকে নিজের কাছে রাখতে পারবেন না রেমব্রান্ট। শোকে ও অপমানে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন শিল্পী। কিছুদিন পর মামলায় রায় বেরোলো, খানিকটা হলেও রেমব্রান্টেরই অনুকূলে। পুত্র টিটুসকে নিজের কাছেই রাখতে পারবেন তিনি, তবে সে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারবেন না কাউকে। মেনে নিলেন রেমব্রান্ট, আদরের টিটুসকে তো কাছে পাবেন। কিন্তু অতটুকু বাচ্চাকে কে দেখবে? হাজার নিন্দাবাদকে উপেক্ষা করেও হেনড্রিকযে রয়ে গেলেন শিল্পীর পরিবারে। সত্যিকারের মায়ের স্নেহ দিয়ে তিনি পালন করে চললেন টিটুসকে। এদিকে রেমব্রান্টের ছবি বিক্রি হয়না, চতুর্দিকে তাঁকে ঘিরে ঘন অপপ্রচার। বড়ো কাজের ফরমায়েশ পাওয়া তো দূরঅস্ত। হেনড্রিকযের পরামর্শে টিটুসের নামে খোলা হল একটি প্রাচীন পুরাবস্তুর কেনাবেচার দোকান। সে ব্যবসাও ভালো চলল না। ১৬৫৫ সালে আইনসম্মতভাবে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করলেন রেমব্রান্ট। নিলামে বিক্রি হয়ে গেল শিল্পীর সাধের বাড়ি, শখের জিনিসপত্র, খাটপালঙ্ক, যাবতীয় ছবি, এমনকি বাসনকোসনও। টিটুসের নামে করা দোকানটিও রেহাই পেল না। সেখানে এসে বসল পাওনাদারদের মনোনীত প্রহরী। আক্ষরিক অর্থেই রাস্তায় নেমে এলেন রেমব্রান্ট, সঙ্গে চোদ্দবছরের বালকপুত্র ও হেনড্রিকযে। তখনও তাঁকে ছেড়ে চলে যাননি সেই রমণী। আমস্টারডাম শহরের সুরম্য অট্টালিকা ছেড়ে বস্তিতে এসে আশ্রয় নিলেন রেমব্রান্ট। তবু কী আশ্চর্য ছবি আঁকার ইচ্ছেটুকু মরেনি তাঁর। এমন একটিও দিন

যায় না, যেদিন তিনি ছবি আঁকেন না। তুমুল দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেও তিনি রচনা করে চলেছেন কালজয়ী এক-একটি ছবি, এঁকে চলেছেন একের পর এক আত্মপ্রতিকৃতি। সেই সঙ্গে আঁকছেন পুত্রের ছবি, স্ত্রীর মর্যাদা না পেয়েও স্ত্রীর অধিক যে রমণী সেই হেনড্রিকযের ছবি। চারিপাশের প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যেও নিভৃতে তাঁর ক্যানভাসে বাজছে সংযমের সুর। চিত্রপটে আলো-আঁধারির মায়া রচনায় প্রবাদপ্রতীম সিদ্ধি তাঁর। আলোকে তো তিনি জেনেছিলেন সেই কোন শৈশবকালে। অন্ধকারকেও তিনি জানতে শুরু করছেন গভীর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে। সাসকিয়ার গর্ভজাত এক-একটি সন্তানের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তো তাঁর সেই পাঠের সূচনা। তারপর ধীরে ধীরে শুধু অন্ধকারকেই তো কাছে পেয়েছেন তিনি। একমাত্র তাঁর তুলির ডগাটুকুতে ব্যতিক্রমের চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে আলোর অবস্থান। সেইটুকুকে সম্বল করেই তিনি এগিয়ে চলেছেন তীব্র অমানিশার দিকে। যে পথে, যে শৈলীতে ছবি এঁকে চলেছেন তিনি সমকালে তার কোনো আদর নেই। ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আশেপাশে সমর্থক বলতে কেউ নেই, তবু কোথা থেকে আত্মপ্রত্যয় পান তিনি? আলো-অন্ধকারের নিদারুণ বৈপরীত্যে রচনা করে চলেন তিনি জীবনের শাশ্বত আলেখ্য। বারবার পর্যবেক্ষণ করেন নিজের মুখ, আবিষ্কার করেন এক বিষন্ন রূপকথা।

১৬৬২ সালে রেমব্রান্ট তার ছেলে ও হবু পুত্রবধূ ম্যাগডালেনাকে (সম্পূর্ণ নাম ম্যাগডালেনা ভান লু) কল্পনা করে ‘দ্য জেউইস ব্রাইড’ নামে একটি অসামান্য ছবি আঁকেন। ছবিতে দেখা যায় একটি পুরুষ তার প্রিয়তমা স্ত্রীর বুকে রেখেছে হাতের স্নেহস্পর্শ। একনজরেই বোঝা যায় নারীটি আসন্নপ্রসবা। তার অন্যমনস্ক চোখদুটিতে যেন সামান্য ভীতির সঞ্চার, চাপা ঠোঁটদুটিতে সন্তানধারণের অনিবার্য শারীরিক কষ্টের মৃদু প্রকাশ। পুরুষটির দু-চোখে ঝরে পড়ছে স্ত্রীর প্রতি সহমর্মিতা। আসন্ন পিতৃত্বের গর্বে সে প্রত্যয়ী তবু যেন উৎকণ্ঠাটুকু লুকোতে পারছে না কোনোভাবেই। কিন্তু সে তার স্ত্রীকে অবিরাম ভরসা আর সাহচর্য দিতে চায় সমস্তরকম উদ্বেগকে দূরে সরিয়ে রেখে। ছবির নেপথ্যে জমাট অন্ধকার যেন অজানা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। কি আছে সেখানে, মেঘমুক্ত সুপ্রভাত নাকি প্রগাঢ় অন্ধকার কোনো তিথি? ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই ছবি যখন আঁকছেন রেমব্রান্ট তখন তাঁর পুত্রের বয়স মাত্র কুড়ি বছর। আর ম্যাগডালেনা নামে অতি দূর

সম্পর্কের যে খুড়তুতো বোনটির সঙ্গে বিয়ে হবে তার সেই মেয়েটির বয়স কতই বা? হয়তো চোদ্দ কিংবা ষোলো। এই ছবি আঁকার মাত্র সাত বছর আগে ১৬৫৫ সালে তেরো বছর বয়সী টিটুসের একটি সুন্দর ছবি এঁকেছিলেন শিল্পী। কচি লাবণ্যে ভরপুর সেই কিশোরের মুখখানি দেখলে স্নেহে আর্দ্র হয় মন। মাত্র কয়েকটি বছরের ব্যবধানে রেমব্রান্ট কী বিস্ময়কর কৌশলে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুললেন পরিণত বয়সের বিবাহিত, আসন্ন পিতৃত্বের গর্বে উদ্ভাসিত টিটুসের মুখ! আরো আশ্চর্যের কথা এখানেই থামলেন না তিনি, আরো একবছর পর আরেকবার আঁকলেন তিনি পুত্রকে। এবারে আর আসন্ন পিতৃত্ব নয়, এই ছবিতে টিটুস ও তার স্ত্রী ম্যাগডালেনার মধ্যে চলে এসেছে দুটি সন্তানও। একটি সন্তান মায়ের কোলে, অন্যটি তার বাবার ডান হাতে ধরা ফুলের দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ময়ে। তাদের সঙ্গে রয়েছে ফুলভর্তি পুষ্পপাত্র হাতে এক কিশোরী পরিচারিকা। ছবিটিতে ম্যাগডালেনার মুখে মাতৃত্বের পূর্ণ তৃপ্তি। টিটুসের চোখে কিছুটা অন্যমনস্কতা। সে কী অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর? নাকি পরিপূর্ণ সুখের মাঝখানে দাঁড়িয়েও অজানা অদৃষ্টের আশঙ্কায় সামান্য হলেও চিন্তিত? তার চোখ দুটিতে ক্লান্ত বিষন্ন ছায়া যেন অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মাঝখানে টলায়মান। এই দোদুল্যমানতা, এই অনিশ্চয়তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় রেমব্রান্টের অতীত জীবনকে। একে একে তিনটি পুত্রকে হারিয়েছেন তিনি, হারিয়েছেন স্ত্রীকে। জীবন থেকে চলে গেছে যাবতীয় বিলাস-বৈভব। ঋণগ্রস্ত হয়েছেন, সম্মানের শেষ সুতোটাও আর অবশিষ্ট নেই – এই রকম একটি জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন আঁকতে আঁকতে পুত্রের চোখের মধ্যেই কী তিনি খুঁজে পাচ্ছেন নিজেকে? তাঁর তুলি কী কেঁপে উঠছে অবোধ্য অস্থিরতায়? তা নাহলে শিশুদুটি ও তাদের মায়ের সর্বাঙ্গ জুড়ে এমন অসামান্য আলোকদ্যুতি দেবার পরেও কেন তিনি টিটুসকে রাখছেন নিকষ অন্ধকারে? শুধু তার মুখটিতে জাগিয়ে রেখেছেন অস্ফুট এক আলো। এ-ছবিতে তার অস্তিত্ব যেন ফ্ল্যাশব্যাকের মতো। রেমব্রান্ট এই ছবিটির নাম রেখেছিলেন ‘একটি পরিবার’। পাঁচবছর ধরে আঁকার পর ছবিটি যখন শেষ হয় তখন ১৬৬৮ সাল। টিটুসের সদ্য বিবাহ হয়েছে। ছাব্বিশ বছরের যুবকের মুখে তখনও দেখা দেয়নি অস্তমিত যৌবনের বিভা। রেমব্রান্ট তবু কেমন করে খুঁজে পাচ্ছেন তার ক্যানভাসে পুত্রের ভবিষ্যৎ-ছবি? ছবি শেষ হবার ঠিক এক বছর পার হতে না হতেই রেমব্রান্টের ক্যানভাসের অন্ধকার অংশটুকু যেন সার্থক হল। টিটুস চলে গেল চিরতরে। তখনও তার বিবাহিত জীবন সাতমাসের পূর্ণতা পায়নি। এবং

ম্যাকডালেনার গর্ভে সদ্য এসেছে শিল্পী-পৌত্রীর ভ্রূণ। রেমব্রান্টের ক্যানভাস টিটুসের স্মৃতিভারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য সন্ধিক্ষণে। শিল্পের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেছে কিনা জানা নেই। অমিত প্রতিভাধর শিল্পী প্রৌঢ়-বয়সে কপর্দকশূণ্য অবস্থায় পৌঁছে, তাঁর কুড়ি-একুশ বছরের পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে আঁকতে শুরু করেছেন তার ভবিষ্যতের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমেত এক পরিপূর্ণ সংসারের ছবি, তদুপরি আঁকতে-আঁকতেই সেই ছবিতে ফুটিয়ে তুলছেন সুখ-স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের দোলাচল, এমন ইতিহাস রেমব্রান্ট ছাড়া দ্বিতীয় কেউ রচনা করতে পারেননি। টিটুসের মৃত্যুর পর রেমব্রান্টের জীবন খুব দ্রুত নিভে আসে। একের পর এক দুরারোগ্য অসুখের আক্রমণ, চরম অর্থাভাব, সামাজিক ঔদাসীন্যকে সঙ্গী করে রেমব্রান্ট পরবর্তী কয়েকটি মাস শুধুই খুঁজে চলেছিলেন নিজেকে। তাঁর হাতের মুঠোর ধরা তুলি শেষবারের মতো মেতে উঠেছিল আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণে, যে প্রতিকৃতিতে রচিত হয়েছে তাঁর নিজেরই এপিটাফ। মৃত্যুকালীন আঁধারে দাঁড়িয়ে অন্তিমবারের জন্যেও আলোকে খুঁজেছিলেন তিনি। শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে পর্যন্ত এমনই প্রত্যয় ছিল তাঁর।

তথ্যসূত্র : ১। Rembrandt : Jessica Hodge; ২। শিল্প ও শিল্পী : কৃষ্ণলাল দাস; ৩। নিজের মুখের ছবি : সমীর ঘোষ; ৪। যে আঁধার আলোর অধিক : বুদ্ধদেব বসু।

চিত্র পরিচিতি : ১। রেমব্রান্টের আত্মপ্রতিকৃতি; ২। নৈশ প্রহরী; ৩। দ্য জেউইস ব্রাইড; ৪। একটি পরিবার।